করোনা ও তারুণ্যের অর্থনীতি ভাবনা

দৃশ্য-০১: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাদের একটা অংশ প্রতিবছরের শেষে কিংবা শুরুতে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার জন্যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে সে প্রক্রিয়া। করোনা পরিস্থিতি ভাল হলেই তাৎক্ষণিকভাবেই তারা একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে।

দৃশ্য-০২: আমাদের দেশীয় আয়ের বড় একটা অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। যার সিংহভাগই মিডেল ইস্টে। কিন্তু মিডেল ইস্টের অধিকাংশ দেশই তেলের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আশংকাজনক হারে কমে যাওয়ায় মন্দার কবলে পরতে যাচ্ছে সে সব দেশ। যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার একটা বড় সম্ভবনা রয়েছে। তার ফলাফল ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পারছি। অনেক দেশ থেকেই কর্মীরা ফেরত আসছে, এবং তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার সম্ভাবনা বা সুযোগ কম।

দৃশ্য-০৩: আইএলও বলছে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ ভাগ চাকরি কমেছে। কমবে আরো বেশি।

দৃশ্য-০৪: বর্তমানে দেশে সরকারি চাকরিজীবীরা বাদে বাকিদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। বেতন কমছে,কিংবা বকেয়া জমছে কিংবা ছাটাই হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য মতে দেশে অনেক তরুন অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় দৃশ্য মতে, দেশে ফেরত আসা অনেক মানুষ বেকার হয়ে চাকরির বা ব্যবসার সন্ধান করবে। তৃতীয় দৃশ্য মতে দেশে চাকরী কমে যাবে। প্রথম তিনটা দৃশ্য যদি আমরা এক সুতায় আনতে চাই, আমরা দেখবো দেশে খুব সহসাই ‘বর্তমান কর্মক্ষম’ মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু সহসাই চাকরি বাড়বে না। তাই অনেক বড় একটা অংশ ব্যবসা করতে আগ্রহী হবে।

ব্যবসায় আগ্রহী হওয়া বড় সংখ্যার মানুষের মূলধন এবং দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিবে। আমরা যদি মূলধন নিয়েই কথা বলি, এই করোনায় পারিবারিক আয় ও সঞ্চয় কমছে। তাই আশংকা করা যায়, ব্যবসার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবেই মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

এক্ষেত্রে ব্যাংক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক বছর ধরেই আমাদের ব্যাংক সেক্টরের অবস্থা ভাল নেই। প্রতিনিয়ত বাড়ছে খেলাপী ঋণের পরিমাণ, অর্থ পাচার তো আছেই। এর পাশাপাশি সরকার বড় একটা পরিমাণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক যদি লোনে সুদের হার বাড়ায় সেক্ষেত্রে নতুন বা ছোট পরিসরে থাকা ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বর্তমানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায় রাতারাতি লাভ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া বড় একটা সংখ্যা ব্যবসা শুরু করতে না পেরে বা চাকরি না পেয়ে বা দক্ষতা অর্জন করতে না পেরে যদি অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সমাজে ক্রাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অতীত মহামারীর পরে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ার ইতিহাস রয়েছে।

আর সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ব্যবসা অনুকূলতা না পেয়ে অনেকেই ব্যবসায় আগ্রহ হারাবে, বাড়বে না বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। বাজারকে বিশ্বাস করতে না পারলে বিনিয়োগ কমে যায়।

এর মাঝেই দৃশ্যমান হবে চতুর্থ দৃশ্য! বড় একটা অংশ তখন কষ্ট করে হলেও সরকারি চাকরির পেছনে ছুটবে। ৩০ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে না, এটাও দেশের জন্যে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি।

সম্ভাব্য ফলাফল গুলো ভয়াবহ। আমাদের এখনি সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি, বাজারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। তরুণদের হাতেই গড়ে উঠতে পারে আগামীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। আবার হতে পারে উল্টোটাও! ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখনি আমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার উপর।

লেখক: ডেভলপমেন্ট এক্টিভিস্ট, ই-মেইল:rafiuahamed1971@gmail.com

প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির

[redacted]

“[redacted]-[redacted]

[redacted]

[redacted]

শিশু’কে জগতের সেরা জিনিয়াস বানায়। ধীরুভাই আম্বানী হয়ে ওঠেন এশিয়ার সেরা ধনী। আমার জীবনকে পরিচালিতকরার জন্য আজও কয়েকটি উক্তি বারে বারে নাড়া দেয়। যেমন-

“যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশা আছে-আর ওই জীবনে প্রাণসঞ্চার করবে যখন প্রত্যাশা তৈরী করবে’’।- আমজাদ হোসেন রাজীব
“দেখবার জন্য আমাদের চোখের যেমন আলোর প্রয়োজন, ঠিক তেমনী কোনো প্রত্যয় অর্জন করবার জন্য আমাদের ভাবনার প্রয়োজন”- নিকোলাস খালব্রাঁশ বলেন।
“পৃথিবীতে এমন কোনও হতাশা আসেনি যা প্রত্যাশা কে পরাজিত করতে পারে”- স্যার বার্ণার্ড উইলিয়ামস।
আপনার প্রত্যাশা কখনই পরাজিত হবে না যদি আপনি প্রত্যাশা বা লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত কাজটির সাথে লেগে থাকেন। বাধা আসলেও তা অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা শক্তি ধারণ করে থাকেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত অনমনীয়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান । কারণ প্রত্যাশার আলোকে আপনার জীবন পরিচালিত হলে, সফল হবেন আপনি, আলোকিত হবেন আপনি এবং আপনি আলোকিত হলে আপনার গ্রাম, আপনার জেলা, পুরো দেশ এমনকি গোটা পৃথিবী উপকৃত হবে।
একটি চমৎকার উক্তি আছে, ‘একটি আলোর কণা পেলে লক্ষ প্রদীপ জ¦লে, একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ^ জগৎ টলে’। অর্থাৎ আপনি সফল হলে, আপনি আলোকিত হলে আপনার প্রভাবে অন্যরাও আলোকিত হবে। আপনি সৎ হলে, সাহসী হলে অন্যরাও আপনার দেখাদেখি সৎ ও সাহসী হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা পাবে। আপনার এলাকায় এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এভাবে সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবীতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিজের এমন ইতিবাচক প্রভাবের ছাপ পৃথিবীর বুকে কে না রাখতে চায়। কিন্তু সবাই কি এরকম সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে? উত্তর যদি না হয়, তবে কেন পারে না?
যারা পারে না, তার কারণ, তারা বড়জোড় চেষ্টা করেন। চেষ্টা হলো, লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্থ হলে যারা আর অগ্রসর হয় না। অগ্রসর হবার আগ্রহ থাকে না। নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যেমন-চেষ্টা করে চৌদ্দতলায় ওঠা যেতে পারে। খুব চেষ্টা করে হয়তোবা পাহাড়ের উঠতে পারবেন। কিন্তু কোনভাবেই এভারেস্টে উঠতে পারবেন না। আপনি চৌদ্দতলায় ভবন কিংবা পাহাড়ের উপর উঠে এই পৃথিবীটাকে যতোটুকু দেখতে পাবেন, আর যদি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন, তাহলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি পৃথিবীটাকে দেখতে পাবেন। আপনি কোনটি চান? সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার। মনে রাখা জরুরী চেষ্টা দিয়ে এভারেস্টে জয় করা সম্ভব নয়। এভারেস্টে জয় করতে হলে চেষ্টার চেয়েও বেশি কিছু দরকার। এই বেশি কিছুটাই হলো

প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি হলো বারুদের মতো যাকে একটি বার প্রজ¦লিত করলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন নিজেদের কাছে। তাদের শক্তিশালি প্রতিশ্রুতিতেই নির্মিত আজকের বাংলাদেশ। দেখবেন সমাজে বেশিরভাগ মানুষ, যারা সফল হয়েছেন তারা শুধু চেষ্টাই করে না বরং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। সুতরাং সফল হতে গেলে এবং ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রত্যাশা অর্জনে আপনাকে অবশ্যই নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি আপনার কাছে আপনি করবেন। মনে রাখবেন অনেক বড় প্রত্যাশা থাকার পরেও বেশিরভাগ মানুষ সফল হতে পারে না। তার বড় কারণ তাদের প্রতিশ্রুতির দূর্বলতা।

প্রতিশ্রুতি তখনই দূর্বল হয় যখন মনের মধ্যে কিছু চিন্তা, প্রতিশ্রুতির প্রতি অনিহা বা সফলতার মুখ না দেখা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। যেমন-আমার দ্বারা কিছুই হবে না! আমি আগে তো পারিনি, এখন কি পারবো! ও আমার থেকে গুণী, যোগ্য, মেধাবী! আজ থাক পরে করবো! আমার অর্থ নেই!
এমন আরও অপ্রাপ্য প্রশ্ন আমাদের গন্তব্যের সোজা পথ থেকে দিশেহারা করে অন্ধকারে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়। নিজের ভালো নিজেকেই বুঝতে হবে। কারণ বর্তমান তরুণ সমাজ পথভ্রষ্ট হলে বাংলাদেশকে নিয়ে সকলের দেখা স্বপ্নও মুখ থুবরে লুটিয়ে যাবে মাটিতে।

সুতরাং সময় কম, সুস্থ্য সমাজ গঠন করতে ও মেধাবী এবং কর্মঠ তারুণ্যের উদ্দীপ্ত শক্তি পেতে যুবকদের মধ্যে স্বপ্নের বীজ বপনের বিকল্প নেই। বিপথে ঝোঁকা থেকে রুঁখতেপ্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।###

লেখক-উন্নয়ন কর্মী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

জগৎ সংসারের শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝে যার একটু সান্ত্বনা আর অনুপ্রেরণা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয়, দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যিনি মাথার উপর ছাঁয়া হয়ে দাড়াঁন তিনিই হলেন পিতা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, এই দরজাকে ধ্বংস করে দিতে পার। অথবা এই দরজাকে রক্ষা করতে পার। (তিরমিযী)

ইসলামে পিতার আনুগত্য ও মর্যদার প্রতি খেয়াল রেখে সদ্ব্যবহার ও আদব রক্ষা করে চলা সন্তানের উপর অপরিহার্য।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের অবস্থা দেখুন! তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় দেখতেন যে, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন। এবং তার যেমন ইচ্ছা হয় নাক, কান, চোখ এবং দেহাবয়ব কাটেন, ফুটা করেন এবং জোড়া লাগান। তারপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। তাহলে, এগুলো কি খোদা হতে পারে? কিম্বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না, এরপর নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ দিলেন।

আর মূর্তি পুজার বিপক্ষে যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের সথে তাঁর পিতার বির্তক হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাকে বললেন, কুরআনের ভাষা: ‘ইব্রাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।’(সুরা মরইয়াম; ৪৬)

এমন কঠোর ও মনোবেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লাম পিতার সম্পর্কের মর্যদা রক্ষা করে বলেছেন যে, কুরআনের ভাষা: ‘আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহ, তিনি আমার প্রতি সতিশয় দয়াবান।’(সুরা মরইয়াম; ৪৭)

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম

ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

ভয় ও আশা-ড. মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন

পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আমার

বান্দাদের বলে দাও, আমি তোপরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি- সেটাও অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!’(সুরা হিজর; ৪৯-৫০)

পবিত্র কুরআনে কারীমায় অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, হা-মিম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। (সুরা মুমিন, ১-৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেমন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তেমনি তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও। একজন মুমিনের দ্বীলের ভিতরে দুইটি প্রকষ্ট থাকবে যার একটিতে থাকবে মহান আল্লাহর ভয় অন্যটিতে থাকবে তাঁর রহমতের আশা। এ জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে হবে আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে।

হজরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুবকের কাছে গেলেন, যখন সে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কি অবস্থায় মনে করছ? সে উত্তর দিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর রহমতের আশা করছি, আবার নিজের গুনাহের জন্য ভয়ও পাচ্ছি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমন মুহূর্তে যার অন্তরে এ দুটি জিনিস একত্রিত হয় তাকে আল্লাহ্ আশার বস্তুটি দান করে থাকেন আর যে জিনিসটি থেকে সে ভয় পায় সে জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে নিরাপদ করে দেন। (তিরমিযী)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি অদৃশ্য জগৎ থেকে আওয়াজ দেয়া হয়: একজন মানুষ ব্যতীত অপর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না, তখন আমি ধারণা করি এবং প্রবল আশা রাখি যে, সে ব্যক্তি আমিই হবে। আর যদি অদৃশ্য জগতের বাণী এই হয় যে, কেবল একটি মাত্র লোক দোজখে যাবে, তবে আশঙ্কা করছি যে, না জানি সেই লোক আমিই হই’ (কিমিয়ায়ে সা’আদত)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে আল্লাহ ভীতি এবং রহমতের আশা সমানভাবে থাকতে হবে। আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরের চালনাকারী, যা তাকে সকল ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে। সকল অকল্যাণ ও বদ-আমল থেকে বিরত রাখে। আর আশা হচ্ছে সম্মুখবর্তী পরিচালক যা বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যায়। বড় বড় নেক-আমল করার হিম্মত ও সাহস বাড়িয়ে দেয়। বদ-আমল থেকে সরিয়ে আনে। আর এটাই হলো গোলামী ও দাসত্বের সারমর্ম।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পুরা বিশ্ব যখন দিগি¦দিক হারিয়ে হতবিহব্বল তখন একজন মুমিনের কাজ হচ্ছে, সে হতবিহব্বল হবে না, দিগি¦দিক হারিয়ে পেরেশান হবে না। সে তার মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করবে আবার তাঁর রহমতের আশাও করতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীর উপর বিভিন্ন রোগ যেমন, প্লেগ, যক্ষ্মা, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতির মাধ্যমে মহামারী প্রেরণ করেছিলেন। আবার নির্দিষ্ট সময় পর তা তুলে নিয়েছেন। যা যুগযুগ ধরে স্থায়ী হয় নি। ঠিক তেমনি বর্তমান বিশ্বে করোনাভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তাও মহান আল্লাহ্ তায়ালা নির্দিষ্ট সময় পর তুলে নেবেন। ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য করনীয় হল সেই মহান মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করে সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করা ও নেক আমালের দিকে ফিরে আসা, আর সাথে সাথে তাঁর রহমতেরও আশা করা।

আসুন আমরা সেই মহান মালিকের নিকটে দু’আ করি, হে মালিক! আমরা আমাদের সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে অপনার দরবারে তাওবা করছি আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। আপনি আমাদেরকে নিরাশ ও হতাশ করবেন না। আমাদের মন্দের কারণে আমাদেরকে আপনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমাদের অপরাধের কারণে আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। (আমিন)
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা।

আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে দেখুন

“ আপনি বিদেশে থাকেন, লেখক, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই।

লিখেছেন সরকার উন্নয়ন নিয়ে কটাক্ষ করে, কোথায় চাল চুরি হয়েছে, অতি সুক্ষ অনিয়মগুলোও আপনার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে যায়। কই ছিলেন আপনি ২০১০ সালের আগে। তখন কি আপনার বিবেকবোধ মনে হয় মায়ের গর্ভে ছিল। যেই না আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো, সাথে সাথে আপনার বিবেকবোধ প্রসব করিলো। যা মনে আসে, যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন। আবার বলেন বাক স্বাধীনতার কথা।

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?
আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৫,১৭। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল। আপনারা বলছেন, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি,

আমার প্রশ্নঃ
তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? সব লুট হলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে কিভাবে। দেশের রিজার্ভ এখন কতো জানেন কি?

বলেন কি!
এসব নাকি কালের বিবর্তনে।আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত

কালের বিবর্তনে কোন উন্নয়ন আপনার চোখে পড়েছে। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যে পরিমান বিদ্যুৎ রেখে গিয়েছিলো, কালের বিবর্তনে তা কমে গেছিলো। দেশ অন্ধকারে ছিল, হারিকেন জ্বালাতেন।

মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে?

গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে? টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। আগের টেন্ডারবাজীর চিত্রগুলো কি আবার মনে করিয়ে দিতে হবে? বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃস্টি হয়েছে। বুঝতে হবে আমেরিকায় থাকেন, এই দেশের আমরা কিন্তু আমেরিকানদের মতো না। ১০ বছরে দেশ ইউরোপ আমেরিকা বানানো সম্ভব না।

The Rome was not build over night. আমেরিকায় আছেন, ওখান ত্রান পাঠালে ত্রান চূরি হবে কি হবে না তা আর বুঝতে বাকি নাই। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট হতে দেখেছি। যা আমার দেশেও হয় না।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? আওয়ামী লীগ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। হাই ওয়েগুলোর দিকে তাকান, পরিবর্তন চোখে পড়ে না? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি ছুতে পারি, স্বচক্ষেও দেখতে পারি নি। স্বচক্ষে দেখেছি এটার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনাকে। দেশ যা কল্পনাও করতে পারি নি, হাতিরঝিল প্রকল্প, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, কর্নফুলী ট্যানেল, বিদ্যুৎ বিপ্লব, পারমাণবিক প্রকল্প, আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর, ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া, এলএনজি গ্যাস, আর দুটি সমুদ্র বন্দর, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। কল্পনা করেছিলেন শেখ হাসিনা, বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন।

কেউ কি আমাকে দেখাতে পারবেন, শেখ হাসিনার মতো আর একজন স্বপ্নবাজ ভিশনারী নেতা যা মাথায় এমন একটি মেগা প্রকল্পের চিন্তা এসেছে বা আসতে পারে? সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ। বুঝলাম আওয়ামী লীগ খারাপ, বিকল্পের নাম বলুন। সমাধানের কথা বলুন। দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ, না হলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনিও কোন দলের দলকানা।

লেখক: সদস্য,প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, করোনা ও আমাদের করনীয়

‘আস্ সালামু আলাইকুম’ ভাইজান কেমন আছেন?আফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে কে যেন পিছন থেকে সালাম দিলেন।ঘাড় বাঁকা করে পিছনে তাকাতেই দেখলাম এক দ্বীনি ভাই। উত্তর দিলাম ‘ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম’। কেমন আছেন? তাতো ভাল, কিন্তু মুখে ঐটা কি লাগিয়েছেন।কেন জানেন না…?আমার উত্তর দেওয়া শেষ না হতেই তিনি বলে উঠলেন, বুঝেছি বুঝেছি ভয়পেয়েছেন তো। এত দিন যে তাবলীগ করলেন……কিন্তু? কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।তিনি পুরা কথাটা না বললেও আমি বুঝে গেলাম তিনি কি বলতে চাচ্ছিলেন। কথাটা মোটামুটি এরকম ‘এত দিন যে তাবলীগ করলেন কিন্তু এখনোদ্বীলের ইয়াকিন ঠিক হলোনা? আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, তাওয়াক্কুল করুন’। কথাটা যদিও আনেকটা এ্যাটম বোমার মতই তারপরও আমি নিজেকে সামলে নিলাম। তাকে মুহাব্বাতের সাথে বুঝানোর চেষ্টা করলাম। মুহাব্বতের সাথে বললাম,ভাই বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।আচ্ছা একটু বোঝার চেষ্টা করুন, গ্রীষ্মেসূর্য যখন প্রখর হয় তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না? উত্তর আসলো, তাতো করি। বর্ষায় যখন বৃষ্টি নামে তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না?তাতো করি। আকাশে যখন কালো মেঘ জমে আর বাতাস বইতে থাকে তখন কি আমরা নিরাপদ স্থানে চলে যেই না?তাতো যাই। তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মুখে মাস্কআর হাতে গ্লাভসব্যবহার করতে বাঁধা কোথায়?

প্রিয় পাঠক আসুন এখন আমরা জেনে নিই তাওয়াক্কুল কাকে বলে? তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ এর অর্থ হলো, ভরসা করা, নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো, আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজে, সকল মকসুদ হাসিল করার জন্য এবং সকল বিপদ-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ

তা’য়ালার উপর ভরসা রাখা।
পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘আর আল্লাহর উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (সূরা মায়েদাহ, ২৩)
মানুষকে দুনিয়ার জীবনে কোননা কোন কাজে কাউকে না কাউকে ভরসা তো করতেই হয়। কোথাও না কোথাও তাকে আত্মসমর্পন করতেই হয়। দুঃখ-বেদনা, সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা-সংকটের কথা কোথাও না কোথাও বলতেই হয়। সেই স্থানটা কোথায়? এখানেই ঈমানদার ও অবিশ্বাসীর মধ্য পাথ্যর্ক্য। অবিশ্বাসী সেই স্থান এমন ব্যক্তি বা বস্ত্তকে বানিয়ে নেয় বাস্তবে যাদের কল্যাণ-অকল্যাণের কোনোই ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাদেরকে ঈমান দান করেছেন, তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছেন তারা তাদের সকল বেদনা, সকল প্রার্থনা এমন একজনের কাছে পেশ করে যিনি বাস্তবেই মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আর যিনি সৃষ্টির প্রতি পরম দয়ালু।

লক্ষ্য করুন, হিজরতের সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুসাওর গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের খোঁজ করতে করতে সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল মক্কার মুশরিকরা। গুহার ভিতর থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন।হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তো আমাদের দেখে ফেলবে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’।(সূরা তওবাহ, ৪০)

শত্রু গুহার মুখে চলে এসেছে, বাহ্যত বাঁচার কোন পথ নেই, ধরা পড়তেই হবে। এই অবস্থায়ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএতমিনান দ্বীলে তার মাহবুবেব প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে বলেছেন নিশ্চয় আমার মাহবুবই আমাদের রক্ষা করবেন। কেউই আমাদের কোন আনিষ্ঠ করতে পারবে না।
মূসা আলাইহিসসাল্লাম ও তার কওম যখন লোহীত সাগরের পাড়ে এসে দাড়াঁল আর পিছনে ছিল ফেরাউনের বাহিনী তখন মূসা আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, হে মুসা আমরাতো ধরা খেয়ে গেলাম। মুসা আলাইহিসসাল্লাম মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার আল্লাহ রয়েছেন।’(সূরা শু‘আরা, ৬১-৬৩)

বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা আলাইহিসসাল্লাম আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রেখে বলছেন, কখনো নয়, অসম্ভব হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন।
তাওয়াক্কুল হচ্ছে ভরসা করা, জীবনের সকল বিষয়ে, কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও আবার অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাবার ক্ষেত্রেও। আর তা এমন সত্ত্বার উপর যিনি সকল বস্ত্তর স্রষ্টা। বস্ত্তর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা। যিনি গোটা জাহানের পালনকর্তা এবং যিনি দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আল্লাহ তা’য়ালা যদিও উপায়-উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন কিন্তু মৌলিক ভাবে তার কোন শক্তি নেই। এই উপকরণের মধ্যে শক্তি দান কারী সত্বা আল্লাহ তা’য়ালার সত্বা। একেই তাওয়াক্কুল বলে।

ভাই আব্দুল ওহহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহিরকথা থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে। তিনি মাখলুক বা উপায়-উপকরণকে নফি করেছেন এভাবে,
১) ইয়ে মাখলুখ হেয়, ইয়ে খোদ নেহি বনা, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো বানায়া।
অর্থাৎ, এটি মাখলুক, এটি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, একে আল্লাহ তা’য়ালা নিজ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
২) ইচকো আন্দারজো ছিফাত হেয় ইয়ে ইচকো আপনা নেহি হায়, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো আন্দার রাখখা।
অর্থাৎ, এর মধ্যে যে গুন আছে তা তার নিজের নয়, এই গুন আল্লাহ তা’য়ালার দেওয়া।
৩) ইয়ে ছিফাত জাহির করনেকেলিয়ে ভিহারআনগারি আল্লাহকা এরাদাকা মোহতাজ, ইয়ে খোদ কুচ নেহি করছাকতা।
অর্থাৎ, এই গুন প্রকাশ করার জন্যও সে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এটি নিজে কিছুই করতে পারে না।

এজন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে খুবভালভাবে মনে রাখতে হবে, মাখলুক বা উপায়-উপকরণ নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, একে আল্লাহ তা’য়ালা নিজের কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে যে গুন আছে তা এর নিজের নয়, এই গুন আল্লাহ তা’য়ালার দেওয়া। এই গুন প্রকাশ করার জন্যও এটি আল্লাহর ইচ্ছার (কুদরতের) উপর নির্ভরশীল, এটি নিজে কিছুই করতে পারে না। এর ব্যতিক্রম হলে তা শিরকে পর্যবসিত হবে। আক্বীদা নষ্ট হবে।

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□-□ □□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□, □□
□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□’□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□
□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□’□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□’□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□(□□□□□ □□□□□□□□)
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□, □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□ □
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□□□□ □□; □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ ‘□□□□□□□□’
(تواكـــل) □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□? □□□□ □□□□□,
‘□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□’
□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□, ‘□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□! □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□’
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □

প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা। এ ব্যপারে ইসলাম আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে।
একবার হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম অর্থাৎ বর্তমানের সিরিয়া সফরে যাচ্ছিলেন। পথে সংবাদ পেলেন, শাম অঞ্চলে মহামারি আকারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এত জটিল রূপ ধারণ করেছে যে, রোগটি দেখা দেওয়া মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে বহু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। উর্দূনে (জর্ডান) হযরত আবু উবায়দা ইবনেল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাজারের কাছে পুরো কবরস্থানটিতে সেইসব সাহাবায়ে কেরাম সমাহিত আছেন, যাঁরা উক্ত প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এই পরিস্থিতিতে ওখানে যাবেন, নাকি ফিরে যাবেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস শোনালেন যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কোন অঞ্চলে যদি প্লেগ দেখা দেয়, তা হলে বাইরের কোন মানুষ যেন উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ না করে আর ওখানকার কোন মানুষ যেন ওখান থেকে পালায়ন না করে।’

এই হাদীসে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যেন আমরা ওখানে না যাই। তাই তিনি শাম সফর মুলতবি করে দিলেন। হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়টিকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করলেন। তাই সে সময় হযরত আবু উবায়দা ইবনেল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালায়ন করছেন?’
অর্থাৎ আল্লাহ যদি এই প্লেগ দ্বারা আমাদের মৃত্যু লিখে রেখে থাকেন, তাহলে যাওয়া না যাওয়া দু-ই তো সমান।
হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বললেন, ‘যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ কথাটা বলত, তাহলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপনি জেনে বুঝে কথাটা বললেন।’
তারপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহর তাকদীরের দিকে পালায়ন করছি।’ (বুখারী, মুসলিম)
ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের আর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একজন কুষ্ঠরোগী মহিলা যে বাইতুল্লার তওয়াফ করছিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাকে দেখে ফেললেন। তিনি মহিলাটিকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী, লোকদরেকে কষ্ট দিও না, তুমি যদি নিজের ঘরে বসে থাক তবে ভাল হয়।

উক্ত মহিলা হারাম শরীফে আসা বন্ধ করে দিল এবং নিজ ঘরে বসে থাকল। (হায়াতুস সাহাবাহ)
এই দুটি ঘটনা হতেই বোঝাযায়, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝাতে চেয়েছেন, সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং এটি তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কারণ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, তোমরা সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে উপায়-উপকরণ হিসেবে গ্রহন করেছেন।
মানুষের স্বভাবের ভিতরে একটি বিপরীত মুখি জযবাবা ঝোক রয়েছে। যদি বলা হয় ওটি স্পর্শকরবেনা তাহলে সেটি স্পর্শ করারপ্রতিআগ্রহ বেড়ে যায়। যদি বলা হয় ওটি ধরবে না তাহলে সেটি ধরার জন্য ছটফট করতে থাকে। আর যদি বলা হয় ওখানে যেওনা তাহলে ওখানে যাওয়ার প্রতি তার ঝোক প্রবণতা বেড়ে যায়।
মহামারীর একটা পর্যায়ে আমাদের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম জন সমাবেশকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেই শুরু থেকেই বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছি যে, জীবন দিয়ে দেব, শহীদ হয়ে যাব, তবুও সমাবেশ ছাড়বনা।

খুব ভাল ভাবে মনে রাখতে হবে, সবক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করার নাম দ্বীন নয়।
সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম অসাধারন একটি উদাহরণ এনেছেন, তিনি বলেন, এক বুযুর্গ, রোগাগ্রস্ত অন্য এক বুযুর্গকে দেখতে গেলেন। দেখলেন, রোগী খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। কিন্তু উহ্ আহ্ করে কষ্ট প্রকাশ না করে আল্লাহ আল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অযিফা জপ করছেন। আগুন্তুক বুযুর্গ বললেন, ভাই আপনার এই আলহামদুলিল্লাহ বলা খুবই প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু এটি তো আল্লাহর কাছে দু’আ করার ক্ষেত্র যে, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন।
আপনি তো এই অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ জপে আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন । ব্যাপারটা এরকম যে, আল্লাহ দেখুন আপনি অসুখ দিয়েছেন কিন্তু আমি কত বীর যে, আমার মুখ থেকে একটি বারের জন্য আহ উচ্চারিত হচ্ছে না। তো আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করা কোন বন্দেগী নয়। আল্লাহর সামনে নিজের অসহায়ত্ব প্রদর্শনের নাম বন্দেগী। তিনি যখন চাচ্ছেন যে, বান্দা! তুমি একটু উহ্ আহ্ করে আমাকে ডাক, তখন অক্ষাম ও অসহায় হয়ে আল্লাহকে ডাক। কীভাবে ডাকবে? যেমন ডেকেছিলেন হযরত আইউব আলাইহিসসাল্লাম, ‘কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি তো পরম দয়ালু।’

নবীদের থেকে বেশি বীর-বাহাদুর কে হবে? এত বড় রোগ! এত অসহনীয় কষ্ট! কিন্তু আল্লাহকে ডাকছেন,‘হে আল্লাহ! আমি কষ্ট পাচ্ছি। আপনি তো পরম দয়ালু।’ (সুরা আম্বিয়া, ৮৩)
এজন্য একেবারে দঃখ বা কষ্ট প্রকাশ না করা কামালাত বা যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। কারণ এটা কোন সুন্নত পদ্ধতি নয়। আল্লাহ যখন চাচ্ছেন, বান্দা তুমি একটু উহ্ আহ্ করো, তখন উহ্ আহ্ করো। আল্লাহর সামনে এত পারঙ্গমতাপ্রদর্শন করা ভালো নয়। এটিও বন্দেগী তথা দাসত্বের পরিপন্থী। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)
মনে করুন, আপনি যে সমাবেশে যাচ্ছেন সে রাস্তার মাঝখানে একটি বাঘ বসে আছে অথবা বিরাট অকৃতির একটি অজগর সাপ রয়েছে। তাহলে আপনি কি বলতেন, আমি শহীদ হয়ে যাব তার পরও ওখানে যাব? আসলে ঘটনা হচ্ছে করোনা ভাইরাস চোঁখে দেখা যায় না বলেই মনের ভিতরে এরকম জযবা তৈরী হয়েছে। মনে রাখবেন জযবা দিয়ে দ্বীন হয় না। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম দ্বীন নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নাম দ্বীন।

একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসল্লাম আদেশ দিলেন, যখন বৃষ্টি হয় এবং ময়লা কাঁদা এত বেশি হয় যে, চলতে ফিরতে মানুষের খুব বেশি কষ্ট হয়, পা পিছলে যাওয়া আশষ্কা হয়, ময়লা-কাদায় পোশাক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, এমতবস্থায় শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে যে, মানুষ মসজিদের স্থলে ঘরে নামায পড়বে । (বুখারী)
অবশ্য বর্তমানে আমরা শহরে বসবাস করি, যেখানে রাস্তাঘাট পাকা। তাই এখানে বৃষ্টিতে এমন দুরাবস্থার সৃষ্টি হয় না। এমন ময়লা-কাদা হয় না, যাতে চলাচল দুষ্কর হয়। কিন্তু যেখানে রাস্তা-ঘাট কাঁচা, সেখানে আজও এই বিধান প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় জামাত মাফ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য ঘরে নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়।
হযরহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ঘটনা ।হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একদিন মসজিদে বসে ছিলেন। ইত্যবসরে আযানের সময় হল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হল। মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। তিনি মুয়াজ্জিনকে বললেন, এ ঘোষণাও করে দাও, ‘সবাই নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন।’
একথা রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত আছে যে, এমতাবস্থায় এ ঘোষণা করে দেয়া চাই। কিন্তু এই বাক্য অন্যান্যাদের কাছে খুব অপরিচিত মনে হল। কারণ সর্বদা মানুষ দেখে ও শুনে আসছে যে, মসজিদ থেকে এ ঘোষণা হয়, ‘নামাযের জন্য আস, সফলতার জন্য আস।’কিন্তু আজ বিপরীত ঘোষণা হচ্ছে, যে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন। তাই লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু

আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! এটা আপনি কি করলেন? আপনি মানুষকে মসজিদে আসতে বারণ করছেন? উত্তরে তিনি বলনে, ‘হ্যাঁ! আমি তা এমন ঘোষণা করাবই। কারণ এমন ঘোষণা সেই সত্ত্বা থেকেও দেয়া হয়েছে,যিনি আমার থেকেও উত্তম এবং তোমার থেকেও উত্তম।’ (বুখারী)

সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এখন যদি কেউ একথা বলে যে, আমার কাছে এ ধরণের ঘোষণা মন্দ লাগে । আমার এমন ঘোষণা করতে লজ্জা লাগে। তার অর্থ হল, তুমি রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করছে। রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘোষণা করেছেন এবং অনুমতিও দিয়েছেন। আর তুমি বলছ, আমি এর অনুমতি দিচ্ছি না, আমার এ ঘোষণা করতে মন্দ লাগে। অতএব দ্বীনের কোন বিষয়ে রসূলের সুন্নাত এবং তাঁর শিক্ষার আগে বাড়ার চেষ্টা করছ।
ডা.আবদুল হাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি কথা বলতেন। হৃদয়পটে যত্ন করে রাখার মত। তিনি বলতেন, ভাই! নিজের কামনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়, বরং দ্বীন হল আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নাম। প্রথমে লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চান? সেটা পূর্ণ করা। এটাই দ্বীন । নিজ আগ্রহ আবেগ, কামনা-বাসনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। যেমন কারো আগ্রহ সৃষ্টি হল প্রথম কাতারে নামায পড়ার প্রতি। কারো মনে জাগল, জিহাদ করবে। কারো মনে চাইল দাওয়াত-তাবলীগে সময় দেবে। এসব তো অবশ্যই সওয়াবের কাজ। নিঃসন্দেহে এগুলো দ্বীনের কাজ। তবে তোমাকে দেখতে হবে, এ মূহুর্তে দ্বীনের চাহিদা কী? যেমন তোমার মনে চাইল, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার। অথচ ঘরে তোমার মাতা-পিতা খুবই অসুস্থ। নড়াচড়া করতে পর্যন্ত পারছেন না। তাহলে এ মুহূর্তে জামাতে শরীক হওয়ার চেয়েও মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব অধিক। এ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে এটাই চান। তাই এ মুহূর্তে তোমর কর্তব্য হবে ঘরে একাকী নামায সেরে নেয়া এবং মাতা-পিতার খেদমতে পরিরপূর্ণভাবে আত্ননিয়োগকরা। এ মুহূর্তে যদি মাতা-পিতার খেদমত না করে তুমি চলে যাও মসজিদে জামাতে শরীক হতে, তাহলে এটার নাম দ্বীন নয় বরং এটা হবে নিজের কামনাকে অগ্রাধিকার দেয়া ।

অবশ্য শরীয়তের এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদ হবে দূরবর্তী অবস্থানে । যদি মসজিদ নিকটেই হয়, সেখানে গেলে মা-বাবার খেদমতে অসুবিধা হবে না, তখন মসজিদে যাওয়াই শ্রেয়।
হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে

একটি উপমা পেশ করেছেন। তাহল যেমন জনমানবহীন কোন এক প্রান্তরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই থাকে । ইত্যবকাশে নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের অবস্থান থেকে মসজিদ অনেক দূরে । স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, নামাযের সময় হয়ে গেছে, আমি মসজিদে যাব নামায পড়ব। স্ত্রী এটা শুনে ভয় পেয়ে গেল, বলল, তুমি আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে? এখানে তো কেউ নেই। তুমি এভাবে চলে গেলে ভয়ে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তুমি যাবে না। স্বামী উত্তর দিল, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার ফযীলত অনেক। আমাকে যেতেই হবে, এ ফযীলত অর্জন করতেই হবে। যা হবার তা হবে, আমি যাবই।

হযরত মসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর নাম দ্বীন নয়। এটা দ্বীনের কাজও নয়। এটা হবে প্রথম কাতারে নামায আদায় করার আশা পূর্ণ করা। কারণ এ মুহূর্তে দ্বীনের দাবি ছিল, স্ত্রীকে একা ছেড়ে না যাওয়া এবং মসজিদের পরিবর্তে ঘরে একাকি নামাজ পড়ে নেয়া। দ্বীনের এই দাবি যেহেতু উপেক্ষিত হল, তাই এটা দ্বীন হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হবে না।

অনুরুপভাবে বাড়িতে যদি মাতা-পিতা অসুস্থ থাকেন, বিবি-বাচ্চা পীড়িত থাকে, যখন তাদের জন্য প্রয়োজন আপনার খেদমত। অথচ আপনার মনে সৃষ্টি হল তাবলীগে যাওয়ার সাধ। তাই আপনি বলে দিলেন, আমি তাবলীগে গেলাম। তাহলে এটা দ্বীন হল না। হাঁ, তাবলীগে যাওয়া অবশ্যই দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এ মুহূর্তের দাবি আপনার তাবলীগ নয়, বরং এ মুহূর্তের দাবী হল খেদমত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমও এখন এটাই। তাই আপনাকে অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই হবে দ্বীন। তাহলেই হবে ইতাআত। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম তো দ্বীন নয়।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, নিজের চাহিদা ও নিজের প্রবৃত্তির তাড়না পূরণের নাম দ্বীন নয়। দ্বীন হল আল্লাহ পাকের আনুগত্যের নাম। তা আমার বুঝে আসুক আর না আসুক। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী) এখন মনে করুন আমি করোনা ভাইরাস বহন করছি এমতাবস্থায় আমি সমাবেশে যোগ দিলাম, আমার পাশে যে ভাইটি ছিল সে আমার নিকট হতে বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো, তার কাছ থেকে তার পরিবারের লোকজন গ্রহন করল। আবার উল্টাটাও হতে পারে, যেমন আমি কোন সমাবেশে গেলাম সেখানে আমার কোন ভাই এই ভাইরাসটি বহন করছিল, তার কাছ থেকে আমি পেয়ে গেলাম, এবার আমি বাসায় আসলাম এবং আমার নিকট হতে আমার বৃদ্ধ মা-বাবা সন্তান-স্ত্রী সহ সকলকে দিয়ে দিলাম। এখন সকলের অসুস্থ

হওয়া শুরু হল এবং কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল তাহলে এটা কি হঠকারিতা নয়। লক্ষ করুন, আমার মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তির তাড়না পূরণ করতে গিয়ে কতগুলো মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন করলাম। মনে রাখবেন ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেখানে গোড়ামীর কোন স্থান নেই।মহান আল্লাহ তা’য়ালা কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।(সূরা বাকারা,২৮৬)

প্রিয় পাঠক, তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আর একটু কথা বাকী রয়েছে। সেটা এখন বলে নিই। একটি বিষয়ে আমাদের অনেকের মনেই খটকা রয়েছে যে, কোন কোন বুজুর্গ তাওয়াক্কুলের তরিকা এই নির্বাচন করেছেন যে, তারা জীবন যাপনের জন্য কোন কাজই করেননি। যার কারনে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। কখনো কখনো মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাদের দানও করেছেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কোন কোন সাহাবীরও এরকম অবস্থা ছিল। যেমন তারা রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করার জন্য আসহাবে সুফফায় এসে পড়ে থাকতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ তা’য়ালা ও রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাশুনা এবং তা থেকে শিক্ষা অর্জন করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের জীবন উপকরেণর কোন পন্থা ছিল না। তারা সুফফায় এজন্য এসে ছিল যে, মহান আল্লাহ তা’য়ালা যদি কিছু দেন খাব অন্যথায় ধৈয্য ধারণ করব। এক হাদীসে আছে, ‘রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল। এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা অর্জনে কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ হতো না। তার কথা ছিল, আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ দিয়েছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগকারীকে বললেন, ‘তার ব্যাপারে আপত্তি করবে না। হতে পারে আল্লাহ তা’য়ালা তার করনেই তোমাদের রিযিক প্রদান (তিরমিযী)

সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন,রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন তাওক্কুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এভাবে এই ধারাবাহিকতা আউলিয়ায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত ছিল।
তবে মনে রাখতে হবে যে আসবার দ্বারা স্বভাবতই ফল উৎকলিত হয়ে যায়। যেমন, মানুষের ক্ষুধা লাগলে খানা ক্ষুধা নিবারণ করে এমন আসবাব বর্জন করা হারাম। অর্থাৎ যদি কারো সামনে খানা উপস্থিত হয় এবং সে

বলে আমি আল্লাহর উপর তাওক্কুল করেছি তিনি আমার ক্ষুধা মিটিয়ে দেবেন। এই বলে সে খানা খায় না। তাহলে মনে রাখুন, যদি সে এমন অবস্থায মৃত্যুবরণ করে তাহলে হারাম মৃত্যু হবে তার। কেননা সবব অর্থাৎ খানা খাওয়াকে গ্রহন করা ফরজ এবং ওয়াজিব।

আসবাবের দ্বিতীয় প্রকার এমন-আসবাব যার মাধ্যমে কখনো ফল লাভ হয় আবার কখনো হয় না। যেমন ঔষধ, তা কখনো উপকার দেয় আবার কখনো উপকার দেয় না। তার হুকুম হল, আমাদের মত দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য এমন আসবাবও বর্জন করা জায়েয নেই। এই আসবাবকে গ্রহন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। কিন্তু যাদেরকে মহান আল্লাহ তা’য়ালাতাঁর সত্ত্বার সাথে বিশেষ সম্পের্কের তাওফীক দান করেছেন তাদের জন্য এ জাতীয় আসবাব বর্জন করাও জায়েজ। তবে শর্ত হল, মহান আল্লাহ তা’য়ালার কাছে কোন অবস্থাতেই যেন অভিযোগ না হয়। মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর দৃঢ় ঈমানদার লোক অনেক সময় এ প্রকারের আসবাব বর্জন করেন। যদি খানা উপস্থিত হয় খানা খান কিন্তু কামাই রুজি অর্জনের ক্ষেত্রে তাওক্কুল করেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক বুজুর্গানে দ্বীন এমনটি করেছেন। যদি কারো মধ্য সহনশক্তি থাকে তাহলে এমন করাও জায়েয। কিন্তু এটা আমাদের মত দুর্বলদের জন্য নয়। কারণ আমাদের মধ্যে শক্তি নেই। যদি কেউ তাদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে মারা যাবে। এজন্য এ ব্যপারে অনুস্মরণ করা যথার্থ নয়।(ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)

মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বেশী বেশী নফল নামাজ, দোওয়া ও এস্তেগফারের মধ্যে লিপ্ত থাকব এবং দ্বীলে দ্বীলে খুব ভয় করতে থাকব এবং মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব এবং এজন্য যে ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার দরকার তা করব।এসময়ে দ্বীলে একথা স্মরন রাখতে হবে যে, করোনা এবং করোনা হতে প্রতিরক্ষার জন্য আমরা যে সমস্ত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছি এদের কারো কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির মালিক এক মাত্র আল্লাহ। আমি যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও অবস্থান করি আর আল্লাহ যদি চান তাহলে ঐ সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও করোনা আমার নিকট পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ! তিনি সকল বস্ত্তর উপর ক্ষমতাশীল। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেখানে কোন প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন এবং যা ইচ্ছা তাই করবেন। বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্ট। যে বস্ত্তকে

[redacted]

[redacted]

সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৫৭০৭। রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই। কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাক।
সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৭১৫। আমর ইবনু শারদ (রাযিঃ)-এর সানাদে তার পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মধ্যে জনৈক কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট (খবর) পাঠালেন যে, আমরা তোমাকে বাইআত করে নিয়েছি; তুমি ফিরে যাও।
সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৫৭৭৪। রোগাক্রান্ত উট নীরোগ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না।
সুনানে আত তিরমিজী, হাদিস নং ১০৬৫। যে গযব বা শাস্তি বানী ইসরাঈলের এক গোষ্ঠীর উপর এসেছিলো, তার বাকী অংশই হচ্ছে মহামারী। অতএব, কোথাও মহামারী দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থানরত থাকলে সে জায়গা হতে চলে এসো না। অপরদিকে কোন এলাকায় এটা দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থান না করলে সে জায়গাতে যেও না। [হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত]
সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৩৪৭৩। প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়েছিল অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান হতে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না। হাদিসগুলো পর্যালোচনায় দুটি বিষয় লক্ষণীয় হয়, যথা:
প্রথমত: সহীহ বুখারির হাদিস নম্বর ৫৭৭৩, ৫৭৭০ ও ৫৭০৭ এর মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া যায় সংক্রমণ বলে কিছু নেই এবয় রোগের কোন সংক্রমণও নেই। সারমর্ম: কোন রোগ সংক্রমক নয়।
দ্বিতীয়ত সহীহ বুখারির হাদিস নম্বর ৫৭০৭ ও ৫৭৭৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৭১৫ এর মাধ্যমে স্পষ্ট নির্দেশ হলো: কুষ্ঠ রোগী হতে দূরে থাক যেমন বাঘ থেকে দূরে থাক এবং রোগাক্রান্ত উটকে নীরোগ উটের সংস্পর্শে নিয়ো না। অর্থাৎ কতিপয় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা পশু হতে সুস্থ্য ব্যক্তি ও পশুকে দূরে রাখ। আবার সুনানে আত তিরমিজী, হাদিস নং ১০৬৫ এ রসুল (সা) মহামারি প্রবণ এলাকা হতে বের হতে বা সে এলাকায় প্রবেশ করা হতে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। একইভাবে সহীহ বুখারির হাদিস নম্বর ৩৪৭৩ এ প্লেগ রোগের নাম উল্লেখ করে একই নির্দেশ দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য মতে, প্লেগ একটি সংক্রামক রোগ। সারমর্ম: সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রাণী হতে দূরে থাক যাতে তা হতে তুমি আক্রান্ত না হও।
বিষয় দুটিকে মিলাতে কষ্ট হচ্ছে? পরস্পর বিপরীতমুখী মনে হচ্ছে? চলুন দেখা যাক বিজ্ঞান কি বলে।
ভাইরাসকেও সামান্য জানি
ভাইরাস (Virus) হল একপ্রকার অতিক্ষুদ্র জৈব কণা বা অণুজীব যারা জীবিত কোষের ভিতরেই মাত্র বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এরা অতি-

তাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
আলেমগণ যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, মসজিদে স্বাভাবিক জামাত হবে, আর হাজার হাজার মানুষ মসজিদে নামায পড়তে যায়। তাদের একজনের যদি করোনা থাকে তাহলে লক্ষ লোকে ছড়াতে সাত দিনের বেশি লাগবে না। আর যদি জানা যায়, মসজিদ হতে লক্ষ লোকে করোনা ছড়িয়েছে, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাব দিহি করতে হতে পারে। মসজিদ হতে সংক্রমিত হয়ে যদি মানুষ মারা যায়, আর সংখ্যাটি যদি অনেক হয়, ভবিষ্যত প্রজন্ম বলবে, যে মসজিদ হতে ব্যাপকভাবে করোনা ছড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, সে মসজিদে যেয়ে কী হবে। তারা মসজিদ বিমুখ হয়ে পড়তে পারে। অতীতে গীর্জা নিয়ে এমন হয়েছে। খৃষ্টানদের গীর্জা বিমুখ হওয়ার পেছনে গীর্জার পাদ্রীদের এমন অনেক ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী। তাই, বাংলাদেশের আলেমদের প্রতি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ রইল।
করোনা ভাইরাসকে হালকাভাবে নিবেন না, আবেগ দিয়েও দেখবেন না।
আমি কী মনে করি?
বন্ধুরা, আমি সরকারের সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করি। আমি গত ২৪ মার্চ যোহরের পর হতে আর মসজিদে যাইনি। এমনকি ২৬ মার্চ হতে বাসার গেইটের বাইরেও যাইনি। বাসায় বাবা, ছেলে ও হোম কেয়ার টেকারকে নিয়ে জামাত করি। আর পরিবারের সবার সাথে সময় কাটাচ্ছি, করোনার সংবাদ শুনছি। অধিকাংশ সময় স্রষ্টা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। লেখক- কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, যশোর।

আজকের বিন্দু বিন্দু জল সমুদ্র না হলেও পুকুর হয়ে যেতে পারে…

বেকারত্ব একটি অভিশাপ। আমারও বেকার দিনগুলির কথা মনে পড়লে অনুধাবন করি কষ্টের যাতনা।

তবে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে, একটি সময়ের পর মহান আল্লাহ তায়ালা কাউকেও বেকার রাখেন না। তিনি কাকে কি রিজিক দিবেন, কিভাবে সম্মানিত করবেন তা নির্ধারিত আছে।আমাদের কাজ হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া। হতাশ হওয়া যাবে না। পাখি যেমন ভোরে বের হয় রিজিকের সন্ধানে সে জানে না কি তার রিজিক, সৃস্টিকর্তা তার জন্যও একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।তেমনি মানুষের কেউই জানে না কি তার নির্ধারিত।

আমি নিজেও কখনো ভাবি নি যে আমি ব্যবসা করব।আমার জীবনে আমি অনেককেই বেকারত্বের কারনে ভুল পথে চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হলে হবে না।

Intention, integrity, hardworking, loyalty to almighty Allah এইগুলি থাকলে আপনি নিশ্চিত জয়ী হবেন।আপনার যা আছে তাই নিয়ে শুরু করুন না, দেখবেন আজকের বিন্দু বিন্দু জল গভীর সমুদ্র না হলেও একটি পুকুর হয়ে যেতে পারে।

আমার যা আছে, কাল বিলম্ব না করে তাই দিয়েই শুরু করতে হবে। ধরুন, আমার সঞ্চয়ে তিন লাখ টাকা জমা হয়েছে। আমি সেটা কাজে লাগাবো। মেহেরপুরে দুই লাখ দিয়ে ৩ টা গাভী কিনবো। ৩ টা গাভীতে দিনে কতটুকু দুধ হয়? মনে হয়, ৪৫ কেজি যার দাম ১৭০০ টাকা, ভরণ পোষণ খরচ সব বাদ দিলেও শুনলাম ১০০০ টাকা দিনে আয় হবে। বাকি ১ লাখ টাকা দিয়ে কবুতর পালন করলে তা থেকেও দিনে ৫০০ টাকা থাকবে। অর্থাৎ মাসে ৪৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। না হয় আরও কিছু কম।

চাকরি করে আর কয় টাকা হয় এগুলোতে তো দেখছি আরো লাভ। এইসব ক্ষেত্রে সরকারী ঋণও পাওয়া যায় সুদবিহীন। একটু মনযোগী হলে আস্তে আস্তে বড় খামারে পরিনত করা যেতে পারে। একদিন আমি হবো একটি বড় খামারের মালিক। আর বসে থাকা যাবে না। আমার যে পুজি আছে তাই নিয়ে নেমে পড়ি। আমার চেষ্টা আর আল্লাহতালার সহায়, আর কে ঠেকায়।।।।।।।

আল্লাহ তায়ালা যেন বেকারদের বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিন, আমিন।

লেখক: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন ।

মানুষ মানুষের শত্রু হয়, জ্ঞানীর কর্ম শত্রুতা নয়

মানুষ মানুষেরই শত্রু হয়। এই মানুষের ভেতরে যে শত্রুতা জন্ম হয়, তা চিহ্নিত করাটা খুুবই কঠিন। পৃৃথিবীতে ‘কে- শত্রু’ আর ‘কে-

অপছন্দ করে। এক কথায় সব কিছুতে তাদের চোখেও খারাপ লাগে। পরশ্রীকাতর প্রতিহিংসাপরায়ন লোকেরা গোপণ শত্রুতা পোষণ করে থাকে। ওদের থেকে অনেক দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের কর্ম ও আচার-আচরণে দৃষ্টি দিলে অনেকাংশে পরিষ্কার হয়। তবে গভীর জলের মাছ ধরতে হলে গভীরে নামতে হবে। তাদের কথা বার্তা ,আচরণ এবং গতিবিধির মধ্যে সর্বপ্রথমেই চলে আসে টাকা বিষয়ক ব্যাপার। কৌশলে টাকা নিতে পারলেই লেনদেন চুকিয়ে দেওয়াটাই তাদের কু-চরিত্রে বিরাজ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মানব সমাজের সব চেয়ে বড় শত্রু হিসাবে গন্য করা যেতেই পারে দু’জাতির মানুষকে,- ১ম হলো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। তারা তো সুযোগ পেলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ৩/৪ গুন বৃদ্ধি করে। ২য় হলো অসাধু ডাক্তার, তারাও নিজেদের স্বার্থে-চিকিৎসা ভিজিট ৮০০/১০০০ করেই দরিদ্র মানুষের পেটে কুড়াল মারে। আর অযথা টেস্ট বানিজ্য এমন পেশার মানুষের আচরণ যেন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। কতটা নিকৃষ্ট হয় এই গুলো মানুষ বলাই বাহুল্য। প্রতিটা স্তরের মানুষ কম হোক বা বেশিই হোক কোনোনা কোনো ভাবেই যেন শত্রুতা করে। ইদানিং পশু-পাখি, বনজঙ্গল কিংবা নানা বস্তুুর উপরে কোনো না কোনো মানুষ- শত্রুতার জেরেই প্রতিশোধ নেয়া শুরু করেছে। এটাও একেবারেই নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে নিজ সহ সকল শ্রেণীর মানুষের ক্ষতির সম্মুখীন হবে নূন্যতম সে জ্ঞান নেই।

বাঙালি আবেগ প্রবণ, আর এমন আবেগপ্রবণতাই যেন তাদের আত্মত্যাগের জন্যেই উদ্বুদ্ধ করে। ভালোবাসাতে যেমন আপ্লুত হতে পারে এ-জাতি, তেমনই- নিষ্ঠুরতা বা শত্রুতার চরম রূপও দেখাতে পারে। অদ্ভুত এক দ্বান্দ্বিক চরিত্র ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আছে মানুষের মধ্যে। চরিত্রের এ বৈপরীত্য দৃশ্যমান হয় কিছু স্বার্থ হাসিলের জন্যেই তা অকপটে বলা যায়। সুতরাং, খুব ভালো মানুষ হতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। আর প্রতিটা মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুন্দর ভাষা বা শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যবহারের প্রভাব অনস্বীকার্য। যদি ধর্মের যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করি- তাহলে বলা যেতেই পারে যে, পবিত্র কোরআনে রয়েছে, শত্রুর সঙ্গে সুন্দর ভাষায় কথা বলা। আরো বলা আছে, ‘মানুষের উচিত শত্রুর নোংরা কথার জবাব খুবই সুন্দর কথায় দিয়ে দেওয়া।’ সূরা, ফুসসিলাতের- চৌঁত্রিশ নম্বর আয়াতে বলাই আছে,- ‘‘সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকি দ্বারাই নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তা হলেই দেখা যাবে যে,- আপনার সাথে শত্রুতা যাঁর ছিল তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও গেছে।’’

আরোহন করে, তার পরও সে সমাজকে মানবীয় পূর্ণতায় সমৃদ্ধ সমাজ বলা যাবে না। যে সমাজের লোক জন একে- অপরের কাছে অনিরাপদ বোধ করে কিংবা একে-অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ ও পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে না বরং ভেতরে ভেতরে শত্রুতা এবং ক্ষতি কামনা করে, ষড়যন্ত্র করে, অপরের ধণ-সম্পদের প্রতি ‘লোভ-লালসা’ লালন করে, সেই সমাজে কোনো রকম শান্তি বা স্বস্তির অস্তিত্ব নেই।

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত ‘বন্ধু’। আর যে ‘বন্ধু’ বন্ধুর বিপদের সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে বন্ধুরূপী শত্রু। তাই বন্ধু নির্বাচনে সদা সতর্ক থাকতেই হবে। প্রচলিত সার্বজনীন মূল্যবোধ, আইন এবং অধিকার-বিরুদ্ধ কর্ম কান্ড যখন সংঘটিত হয় তখনই মানুষের প্রতি মানুষের শত্রুতা এবং অবিচার সৃষ্টি হয়। শুধু মাত্র ন্যায়নীতির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই সর্বস্তরের শত্রুতাকে দমন করে “শান্তি প্রতিষ্ঠা” করা সম্ভব। অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতে হয়, যেখানে ন্যায়নীতি আছে সেখানেই শান্তি আছে। আবার যেখানে ন্যায়বিচার নেই কিংবা আদর্শবোধ বা সহনশীলতা নেই, সেখানে কখনো শান্তি বিরাজ করতে পারে না। নিজ ঘর হতে শুরু করে গোষ্ঠী এবং জাতি সকল ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

সর্বশেষে বলতে চাই যে, ‘আমার হাতে কোন পাথর নেই, আমার সাথে কারও শত্রুতা নেই। আমি কারও সাথে যে দূর্ব্যবহার করি না, কেননা আমি গোলাপ বাগানের মতই সুমিষ্ট’। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি’র এমন নান্দনিক কিংবা শৈল্পিক কথার সাথেই সৎ সাহস নিয়ে আজকের বর্তমান সমাজের মানুষ নিজকে উপস্থাপন করতে পারে না। কারণ দেখা যায় তারা কখনো না কখনো যেকোনো ভাবেই যেন শত্রুতা করে। আবার ”শত্রুরা শত্রুতা করতে কৌশলে ব্যর্থ হলে তারপর বন্ধুত্বের সুরত ধরে”। এ কথা হযরত আলী (রাঃ) উক্তি। সুতরাং মানুষের এই চরিত্রের পরিবর্তন করানোটা খুবই কঠিন। তবুও- বুদ্ধির জোরেই শত্রুকে জয় করা প্রয়োজন। নেলসন ম্যান্ডেলার সাথেও একমত পোষণ করে বলা যায়,- “আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই শান্তি চান,.. আপনাকে আপনার শত্রুদের সাথেই কাজ করতে হবে, তাহলেই তিনি আপনার সহকর্মী হতে পারবে। তবুও একটি কথা বলতেই চাই যে হত্যা, সন্ত্রাস, নাশকতা বা গুজবের মতো শত্রুতা না করে সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গল পথে সততা দিয়েই নিজেকে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। সুতরাং শত্রুতার উপরেই দাঁড়ানো মানুষদের মনোবল কিংবা নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া নিকৃষ্ট মনের পরিচয়।

লেখক: টিভি ও মঞ্চ অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, কলামিষ্ট এবং প্রভাষক।

[redacted]

[redacted]

ইসলাম’ একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে যেমন ব্যক্তিগত জীবনাচার আছে, আছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাও। মুসলিমরা তাদের আইনে চলতে পারে ও অন্যরা তাদের রীতি-নীতিতে চলতে পারে সরকার তার দায়িত্ব নিবে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সবার জন্য রাষ্ট্রসংবিধান সমান।

মুসলিম হিসাবে আমার সংবিধান পবিত্র আল-কোরআন, হিন্দুদের বেদ, খৃস্টানের বাইবেল। আমি যেন কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলতে পারি সেই গ্যারান্টি রাষ্ট্রকেই দিতেই হবে। অন্যদের বেলাও তাদেরটাও তাই। কিন্তু সরকারগুলো বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা চালায় জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে নিজের পক্ষে রাখতে।

ভোটের রাজনীতিতে ধর্ম যেহেতু বিরাট একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই রাজনীতির অন্য সব অঙ্গনের মত ধর্মকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন প্রতারণা মূলক পন্থা অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম ঘোষণা করা, এতে না ইসলামের কোনো লাভ হয়, আর না রাষ্ট্রের কোনো বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে। বরং মুসলিমরা যদি সত্যিকার ইমানদার হয়, নিজেদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামের রুজূকে ধারণ করে তাতেই সফলতা আসবে, বিশ্ব ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

আমাদের দেশে মুসলমানদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত, যা আলাপ আলোচনার সমাধান প্রয়োজন। যেমন, সুদ। সুদের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখাও ইসলামে হারাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সুদের উপর। আবার কোর’আনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে। হাদীসে জাতির ঐক্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রসুল এ পর্যন্ত বলেছেন যে, কোর’আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করা কুফর।

বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন- আমার পর তোমরা একে অপরকে হত্যা করে কুফরি কর না। অর্থাৎ ইসলামের হুকুম হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ থাকা। কিন্তু বাস্তবে আমরা পাশ্চাত্যের তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদকে ভিত্তি করে বহুবিধ দল-উপদলে বিভক্ত এবং ধর্মীয়ভাবে শত শত ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত হয়ে আছি।

এক দলের মানুষের হাতে অহরহ প্রাণ হারাচ্ছে আরেক দলের মানুষ। তাহলে ইসলাম রইল কোথায়? আল্লাহ বলেছেন দান কর, ব্যয় কর, আমরা যক্ষের ধনের মত সম্পদ আঁকড়ে থাকি, আল্লাহ বলেছেন এতিমের প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দাও, আমরা এতিমের সম্পদ ভোগ করার জন্য প্রয়োজনে

তাকে হত্যা করি, আল্লাহ বলছেন আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে জীবন-সম্পদ ব্যয় করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কর, আমরা তা কি করছি?

আল্লাহ আমাদের শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার জন্য যে সত্য দ্বীন প্রেরণ করেছেন তাকে কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ করে রাখলেই শান্তি এসে যাবে না। তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

সংখ্যাগুরুর দাপটে আমাদের মতামত যদি রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিই। ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা যদি তাদের সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় মতামত রাষ্ট্রের উপর চাপায়, তাতে কি আমরা মেনে নিবো বা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে?

বরং দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার সম্ভব বলে আমি মনে করি।
– প্রকাশক মেহেরপুর প্রতিদিন